আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যে ধরনের ভুমিকা আইনজিবিরা পালন করে ঠিক একই ধরনের গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা জনস্বাস্থের উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাখতে পারেন।

মনজিল মোরসেদ
এডভোকেট
সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ

খাদ্য মানুষের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা ব্যতিত বেঁচে থাকা কল্পনা করা যায় না এবং অসম্ভব। সে খাদ্যকে নিয়ে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীদের বে-আইনী কর্মকান্ড আমাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে বিঘ্নিত করছে। কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী বিভিন্ন খাদ্যে ভেজাল তো মিশ্রন করছেই সাথে সাথে আম, আপেল, কলা, পেপে ইত্যাদিতে বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল যেমন, কারবাইড এবং ফরমালিন ব্যবহার করে ফলগুলো পাকানো হয়। এ যাবতীয় কেমিক্যাল ব্যবহারের কারনে আমাদের স্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পরেছে। বিশেষ করে শিশুরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এধরনের একটি জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিন দিন অসাধু ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন তৎপরতার কারনে হাজার হাজার মানুষ রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং সাধারণ গরীব মানুষের অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা ব্যয়বার বহনে অক্ষমতার কারণে তারা জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আইনে বিভিন্ন নির্দেশনা থাকা সত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বিভিন্ন ব্যর্থতায় এবং অসাধু ব্যবসায়িদের অসৎ উদ্দেশ্যে ফল সবজি, মাছ ইত্যাদিতে কেমিক্যাল জাতীয় উপাদান ব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখিন।

মানুষের জীবনধারনের অন্যতম প্রধান উপাদান খাদ্য। খাদ্য অর্থ অবশ্যই বিশুদ্ধ খাদ্য। খাদ্যের এ ভেজাল প্রসারে মানুষের জীবনধারন এক কঠিন পরিস্থিতির সন্মুখিন। পুর্বের চেয়ে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি সত্বেও বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ন। অন্যদিকে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এর কারণে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের বিভিন্ন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে খাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়ায় তার একটি পরোক্ষ প্রভাব আমাদের স্বাস্থ্যের উপর পড়েছে কারন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারে প্রাকৃতিক উপায়ের মত বিশুদ্ধ খাদ্য উৎপাদন সম্ভব নয়। খাদ্য স্বল্পতার সময় থেকে এর ব্যবসায়িক গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং মুনাফার অন্যতম সুযোগ সৃষ্ট্রি হওয়ায় অসাধু ব্যবসায়িদের দৃষ্টি খাদ্যকে নিয়ে আবর্তিত হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন খাদ্যে ভেজাল মিশ্রনের প্রবনতা দেখা যায়। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য যেমন- মাছ, মাংস, সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি সকল খাদ্যেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এক ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার, অপর দিকে সরবরাহকালিন কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীর অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ভেজাল মিশ্রনের কারণে আমরা খাদ্যের স্বাভাবিক গুনাগুন থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল ৩২ অনুসারে বেঁচে থাকার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য যে সু-স্বাস্থ্য প্রয়োজন তা বিভিন্ন ভেজাল খাদ্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এক কথায় পরোক্ষভাবে খাদ্যে ভেজালের কারণে সংবিধান স্বীকৃত জীবনের স্বাভাবিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মৌলনীতিতে আর্টিকেল ১৮(১) অনুসারে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হল পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থের উন্নয়ন সাধন। যা নিশ্চিত করতে হলে ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে ।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ২১ ধারায় মহাপরিচালককে ক্ষমতা দেয় হয়েছে স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য পন্য উৎপাদন বিক্রয় বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের। ২৭ ধারায় স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য পন্য উৎপাদন বিক্রয় বন্ধে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ৪১ ধারায় ভেজাল খাদ্য বিক্রয়ের জন্য ৩ বছরের কারাদন্ড দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে । এমনকি মোড়ক ব্যবহার না করা, মুল্য

তালিকা প্রদর্শন না করা, অধিক মুল্যে বিক্রয়, নিষিদ্ধ দ্রব্য খাদ্যে মিশ্রন, মিথ্যা বিজ্ঞাপন, মেয়াদ উত্তীর্ন পন্য বিক্রির জন্য বিভিন্ন সাজার বিধান করা হয়েছে কিন্তু এর প্রয়োগ কতটুকু। উপরন্তু ভোক্তাদের সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ৫ ধারায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন পরিষদ গঠন করে বিভিন্ন দায় দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে কিন্তু খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে তারা কতটুকু দায়িত্ব পালন করে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষন করছেন তা প্রশ্নবিদ্ধ।

খাদ্যের গুনাগুন ও বিশুদ্ধতা রক্ষায় প্রচলিত আইন The Pure Food Ordinance ১৯৫৯ এর ৩ ধারা অনুসারে যে কোন খাদ্যে যদি বিষাক্ত যাবতীয় কোন উপাদান থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এরকম খাদ্যকে ভেজাল খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একই আইনে খাদ্যের সংজ্ঞায় মাছ, মাংস, সবজি, পানি, তৈল, ঔষধ এবং অন্যান্য উপাদানকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো মানুষের জীবন ধারনের প্রয়োজন। আইনের বিধান অনুসারে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য সরকারের উপর কতিপয় দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। যেখানে National Food Safety Adversary Council গঠন করা এবং তার মাধ্যমে গুণগত ও উন্নত খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হলেও বাংলাদেশে বর্তমানে যে হারে খাদ্যে ভেজাল এবং রাসায়নিক উপাদান মিশ্রিত খাদ্য বিভিন্ন ভাবে বাজারে বিক্রয় হচ্ছে তা নিয়ন্ত্রনের জন্য আইনে প্রদত্ত উক্ত কমিটি তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছেনা। উক্ত আইনের ৬(১) ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি এমন কোন খাদ্য বিক্রয় বা উৎপাদন করবে না যেটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু বাংলাদেশের সকল জায়গায় এ ধরনের ভেজাল খাদ্য অহরহ বিক্রি হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে পর্য্যাপ্ত কোন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। যার কারণে মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার দিন দিন ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হচ্ছে। এর ফলে স্বাস্থ্য খাতে সরকারের খরচ হাজার হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত আইনে এমন বিধান করা হয়েছে যে, কোন খাদ্য সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না। উক্ত আইনের ১৯(১) ধারায় এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়ায় এ ধরনের মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য সম্বিলিত বিজ্ঞাপন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে এবং স্বনামধন্য ব্যক্তিদেরকে বিজ্ঞাপন ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত আইনে ভেজাল খাদ্য বিক্রি এবং উপাদনের জন্য অপরাধীদের বিভিন্নভাবে শাস্তির বিধান করা আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে না।

The Pure Food Ordinance এর ২৮(১) ধারায় নাগরিকেদের জন্য বিভিন্ন এলাকায় পাবলিক এনালাইস্ট এর মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার অধিকার দেয়া আছে কিন্তু এ ধরনের পাবলিক এনালাইস্ট নিয়োগের মাধ্যমে জনগণের সে অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। উক্ত আইনের ৪১ (এ) ধারায় খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারী অপরাধীদের বিভিন্ন শাস্তি প্রদানের জন্য Food Court স্থাপনের বিধান রয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি রোধ করার লক্ষ্যে জনস্বার্থে 'হিউম্যান রাইটস্ এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ' (এইচআরপিবি) ২০০৯ সালে হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন দায়ের করলে শুনানী শেষে বিচারপতি এ, বি,এম খায়রুল হক এবং বিচারপতি মোঃ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এর আদালত প্রত্যেকটি জেলায় ও মহানগরীতে পাবলিক এনালাইস্ট অব ফুড নিয়োগ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং প্রতিটি জেলায় ও মহানগরীতে দুই বৎসরের মধ্যে Food Court স্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করেন। হাইকোর্ট এর রায় অনুসারে ফুড কোর্ট স্থাপন করা হলেও এখনও পাবলিক এনালাইস্ট অব ফুড নিয়োগ করা হয়নি। উক্ত রায়ের পুর্নাংগ বাস্তবায়ন না করেই ২০১৩ সাল বিশুদ্ধ খাদ্য আইন প্রনয়ন করা হয়। তা সত্বেও অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের অধিক মুনাফা লাভের লক্ষ্যে খাদ্যে ভেজাল অব্যাহত রেখেছে বছরের পর বছর।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষায় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা চেয়ে জনস্বার্থে 'হিউম্যান রাইস্ এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ' ২০১০ সালে একটি রীট পিটিশন দায়ের করে। উক্ত রীট মামলায় বিচারপতি এ, এইচ, এম শামসুদ্দিন চৌধুরি এবং বিচারপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন এর আদালত রায় দেন এবং ৪ দফা নির্দেশনা দেন যেমন;

ফলে ক্যামিকেল ব্যবহার বন্ধে গাইডলাইন তৈরী এবং প্রশাসনের সর্ব পর্য্যায়ে তা বিতরন, প্রত্যেক ল্যান্ড ও সী পোর্টে Chemical Test Unite [CTU] স্থাপন এবং আমদানী কৃত সব ফল রাসায়নিক পরীক্ষা করে ক্যামিকেল মুক্ত হলে দেশে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা, প্রত্যক আমের সিজনে প্রধান আম বাগানগুলোতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়োজিত করা যাতে ফল পাকানোতে ক্যামিকেল ব্যবহার করতে না পারে, ফল মৌসুমে প্রতি মাসে আড়তগুলোতে মনিটরিং করা যাতে ফল পাকানোতে ক্যামিকেল ব্যবহার করতে না পারে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রত্যেক ইউনিটে সার্কুলার পাঠিয়ে ফলে ক্যামিকেল ব্যবহার কারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন গত পদক্ষেপ গ্রহন করার নির্দেশনা প্রদান। উক্ত নির্দেশনাগুলি বাস্তবায়িত হলে তার সুফল জনগন পেত।

১৯৭৪ সনে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (সি) ধারায় খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান করা হয়েছে যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। এ ধরনের আইনের বিধান থাকা সত্বেও এখন পর্যন্ত খাদ্যে ভেজালের কারনে কোন অপরাধীদের মৃত্যুদন্ড হয়েছে এরকম তথ্য জানা যায় না। শুধুমাত্র খাদ্যেই নয় ঔষধ ভেজালকারী ও বিক্রয়কারীদের বিরুদ্ধেও এ ধরনের অপরাধের শাস্তির বিধান মৃত্যুদন্ড কিন্তু কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে খাদ্যে ভেজালকারীদের ব্যবসার জন্য অন্যতম ভালো স্থান বাংলাদেশ। কিন্তু এধরনের অপরাধীদের প্রতিরোধ করে মানুষের জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে জীবনের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও প্রশাসন ও সরকারের নির্লিপ্তার কারণে আইনের কোন সুফল জনসাধারণ পাচ্ছে না।

সংবিধানের আর্টিকেল ২১ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল পাবলিক ডিউটি পালন করা এবং আইন ও সংবিধান মেনে চলা । আইন ও সংবিধানে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও জীবনের অধিকার রক্ষা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সরকারের উপর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকলেও তা পালনে প্রশাসন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা অনেক সময় ব্যর্থ হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে খাদ্যে ভেজালের প্রবনতা দিন দিন বেড়েই চলছে এবং নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার অধিকার বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ইদানিং কালে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে, যে সকল ভয়াবহ চিত্র মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে তাতে দেখা যায় অসাধু ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন কুখাদ্য অর্থের লোভে খাদ্য হিসেবে বাজারে প্রচলন করে জনগণকে তা গ্রহণের জন্য বাধ্য করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম মারাত্মক স্বাস্থ্যের ঝুঁকিতে পড়বে যা হয়তো কোনভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং এখনই খাদ্যে ভেজাল কারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

আইনগত ব্যবস্থা প্রয়েগের প্রশ্ন আসলেই আইনজিবিদের ভুমিকার প্রশ্ন চলে আসে। সমাজ উন্নয়নে বা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যে ধরনের ভুমিকা আইনজিবিরা পালন করে ঠিক একই ধরনের গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করতে পারে আইনজিবিরা। খাদ্য যেহেতু আমাদের জীবন ধারনের প্রধান উপাদান সেহুতু খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনে আমরা আইনজিবিরা মানুষের জীবন হরনকারী হিসেবে তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারি । শুধু তাই নয় আইনজিবিরা কোর্ট অফিসার হিসেবে আদালতের নিকট এ ধরনের মামলায় অভিযুক্ত অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট ভুমিকা রাখতে পারে। জনগনের মাঝে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রনকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ভুমিকা রাখতে পারে।

অন্যদিকে আইনজিবিরা তাদের ব্যবসায়ী মক্কেলদেরকে এ ধরনের ভেজাল খাদ্যের কুফল সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে নিবৃত্ত করতে পারে।